International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-III, November 2017, Page No. 31-38
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

দুটি অমর প্রেম গাঁথা : লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ

হামিদা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

In the medieval Bengali literature the trend of translated literature has occupied a prominent place. This literature section is mainly divided into two branches. The first branch was translated literary from Sanskrit literature. Second branch was translated from Arabic, Hindi and Farsi literature. The trend of Bengali translated literature started on fifteenth century. Described here the second branch literature is called 'Islamic literature'. In this Islamic literature a prominent literary genre was Bengali romantic 'pronoy upakhyan'. Most of the Bengali middle age literature wrote based on spiritual believe. But Islamic romantic 'pronoy upakhyan' described only human love. Bengali musolman romantic poets followed Arabic, Farsi and Hindi romantic poetry. Hindi Farsi poets have enacted the humanism in the theory of God-ship. This theory was the Sufi theology. But Bengali poets translated this poetry like as demotic 'upakhyan'. In this poem there was love craze, as well as thirst, adventure, action and unpredictable excursion. Most of the 'upakyan' was converged love story. But in some texts we see the sad consequence of love. Two such 'upakhyan' are 'Lailee-Mojnu' and 'Shiri-Forhad'. These poems were so popular in the Islamic society that the poems have been translated many times. In this article we will discuss these two 'upakyan' in analytical and comparative manner.

Key Word: Arabic, Hindi, Farsi, Translate, Romantic.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারায় একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য হচ্ছে রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যানের ধারা। ঐ সময়ের অন্যান্য কাব্য সাহিত্যে লৌকিক জীবনের ছায়াপাত থাকলেও তাতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজারতি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু রোমান্টিক প্রণয়কাব্যে শুধু মর্ত্য মানুষের জীবন পিপাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলার রোমান্টিক কাব্যের কবিরা অনুসরণ করেছেন আরবি-ফারসি, হিন্দি প্রণয় উপাখ্যানমূলক কাব্যগুলিকে। হিন্দি-ফারসির কবিরা মানবপ্রেমের রূপকে ঈশ্বরপ্রেমের তত্ত্ব আরোপ করেন, যা সুফি ধর্মমতের পরিপোষক। তবে বাঙালি কবিরা কাব্যগুলি অনূদিত করেছেন লৌকিক প্রণয় উপাখ্যানরূপে। এসব কাব্যে রয়েছে প্রেমাকুলতা, রূপতৃষ্ণা, সৌন্দর্যলিপ্সা, অনির্দ্দেশ্য অভিযাত্রা, দুঃসাহসিক কর্ম। এই ধরণের কাব্যে বর্ণিত বেশিরভাগ প্রেম মিলনাত্মক। তবে কিছু কিছু কাব্যে প্রেমের করুণ পরিণতি আমরা দেখি। এরকমই দুটি কাব্য হচ্ছে 'লায়লী মজনু' এবং 'শিরি ফরহাদ'। দুটি কাব্যই আরবি ফারসি কাব্যধারা থেকে এসেছে। এই প্রবন্ধে এই দুটি কাব্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

বাংলায় ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই আরব্য-পারস্যের সাথে বাংলার যোগাযোগ ছিল। ব্যবসাসূত্রে অনেক আরব্য পারস্য বণিক বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন। ফলে বাংলার সঙ্গে ইরাণ ও মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেই সূত্রে ইরাণি বনিক ও বাণিজ্যপণ্যের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনি, প্রকৌশলী-কারিগর, সুফি-দরবেশ এবং শিল্পিদের আগমন ঘটে বাংলায়। এরফলে ইরাণের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই আমরা দেখি বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্ব থেকেই ফারসি ভাষার চর্চা শুরু হয়। মুসলমান শাসনামলের সময় থেকে ফারসিকে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করায় ভারত উপমহাদেশে ফারসি ভাষার গুরত্ব বাড়তে থাকে এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও এই ভাষার প্রভাব পড়ে। ছয়শ বছরের অধিককালব্যাপী ফারসি ছিল বাংলার রাষ্ট্র ভাষা। এই দীর্ঘ সময়ে হাজার হাজার ফারসি কাব্য রচিত হয়েছে। বাংলার কবিরা এই ফারসি কাব্যগুলিকে বাংলায় অনূদিত করেছেন। এই আরবি ফারসি অনূসারী কাব্যগুলি মুসলমান সমাজে এত জনপ্রিয় ছিল যে কাব্যগুলি যুগপোযোগী বারবার অনূদিত হয়েছে। এই কাব্য ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লী-মজনু', 'শিরি-ফরহাদ', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' ইত্যাদি। 'লায়লী-মজনু' এবং 'শিরি-ফরহাদ' এর অমর কাহিনি আজ ও আমাদের সমাজে জনপ্রিয়।

'লায়লী-মজনু': "লায়লী মজনুর প্রণয়কথা একটি কল্পিত উপাখ্যান। এই অপরূপ উপাখ্যানটি কার মানস-সন্ততি তা জানার উপায় মেলেনি আজও। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস এ উপাখ্যান সম্বন্ধে নীরব। লাইলী মজনু সম্পর্কে কোন কিংবদন্তী ও চালু নেই আরবে"[১] তবে ঘটনাস্থল এবং পাত্র-পাত্রী আরবীয়। তাই আমরা মনে করি আরবের লোকগাথা লায়লী-মজনু কাহিনির উৎস। এই উপাখ্যান নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেছেন ফারসি কবি নিজামী। এরপর আব্দুর রাহমান জামী ও লায়লী-মজনুর কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়া ফারসি ভাষায় আরও কয়েকজন কবি ও কাব্য এই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। বাংলায় লায়লী মজুনুর কাহিনি নিয়ে প্রথম কাব্য রচনা করেছেন দৌলত উজির বাহারাম খান। কবির আবির্ভাবকাল ও কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। দৌলত উজির সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস হচ্ছে কবি প্রদত্ত আত্মজীবনী কিন্তু তাতে কাব্যের রচনাকাল এবং কবির সমকাল সম্পর্কে কাব্য রচয়িতা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন। আত্মবিবরণী অংশে কবি বলেছেন—

"পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হুসেন শাহার।
তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েতে শোভিত মনুহর।।
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহার গুণের অন্ত নাই।।

এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেতে উতপতি।
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপম
সদায়ে ধর্মেতে তান মতি।।
তান পুত্র ক্ষুদ্র-সম নাম মোর বহরম
মহারাজ গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।"[২]

কবি যে তথ্য দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম মোবারক খান। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নেজাম শাহাসুর থেকে কবি এই উপাধি পান। কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের প্রধান অমাত্য ছিলেন। এই বংশেই কবির জন্ম। হোসেন শাহ হামিদ খানকে চট্টগ্রামের জায়গীরধার করেছিলেন। সেই থেকে কবির পূর্বপুরুষরা চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন। কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তবে আহমদ শরীফ 'লায়লী-মজনু' সম্পাদনা করতে গিয়ে সময়কাল সম্পর্কে পুঙ্খানুপুখ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ১৫৮৩ থেকে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কাব্যটি রচিত হয়েছে।

'লায়লী-মজনু'র কাহিনি আমাদের সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল তাই দেখা যায় গদ্য এবং পদ্য উভয় রীতিতে 'লায়লী-মজনু' রচিত হয়েছে। বাহারাম খানের পর দুভাষী পুথিকার কবি মহম্মদ খাতের 'দেওয়ানা মজনু' নামে পুথি রচনা করেন। জহিরুল হক ও এই কাহিনি নিয়ে কাব্য লেখেন। গদ্যে যাঁরা লায়লী-মজনু গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহেশ মিত্র, শেখ ফজলুল করিম, আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ।

"অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহে তার বিকাশ, কিন্তু মিলনেই তার সার্থকতা। যে প্রেম মিলনমুখী নয়, তাতে আছে কেবল দাহ, মন আত্মা-দেহের অপমৃত্যুই তার পরিণাম। লায়লীর ও মজনুর প্রেম বিরহেই অবসিত। দুই দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা জমাট হয়ে আছ।"[৩] আলোচ্য কাব্যে বিরহানলে দগ্ধ দুটো হৃদয়ের জ্বালাযন্ত্রণার ইতিকথা পরিব্যক্ত। আত্মবিশ্বাস, আদর্শনিষ্ঠা, সহনশীলতা প্রত্যয়দৃঢ়তা তিতিক্ষা এবং নির্যাতনপ্রসূত কারুণ্য ও যন্ত্রণাজাত বেদনাই এই মহৎ কাব্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু।

মূল কাব্যকাহিনিতে আমরা দেখি আরবের আমীর নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র কয়েস। শৈশব থেকেই কয়েস ছিল সৌন্দর্যপিয়াসী। সাত বছর বয়সেই কয়েস সুপুরুষ হয়ে উঠে। এবার পিতা তার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কয়েস ভর্তি হয় পাঠশালায়। এই পাঠশালায় ছেলে মেয়ে সবাই একসঙ্গে পড়ত। এখানেই লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কয়েস এর। লায়লীর বাবা মালিক ছিলেন একজন সওদাগর। প্রথম সাক্ষাতেই কয়েস লায়লীর প্রেমে পড়ে যায়। লায়লীও সুপুরুষ কয়েস এর রূপে মোহিত হয় এবং তার মনেও কয়েস এর জন্য প্রেমানুভুতির সৃষ্টি হয়। দিনে দিনে এই প্রেম আরও গাড় হয়। পাঠশালায় যাওয়ার পথে দুজনের দেখা হত। একদিন দুজনে মিলে শপথ করে—

"যাবত জীবন প্রেম না করিব ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিব পতঙ্গ।"[৪]

পাঠশালায় লায়লী না এলে মজনু গৃহে গিয়ে দেখা করে আসে। তাদের প্রেম কথা সহপাঠীরা জানতে পেরে গুরুকে বলে দেয়। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং এই ঘটনা লায়লীর মা-কে জানিয়ে দিলেন। লায়লীর মা লায়লীকে খুব শাসন করলেন এবং কূলকলঙ্ক ভয়ে লায়লীর পাঠশালা বন্ধ করে দেন। লায়লী যাতে ঘর থেকে না বেরিয়ে যায় সেজন্য চারপাশে পাহারা রাখলেন। এদিকে লায়লীর দেখা না পেয়ে কয়েস অস্থির, পাগলপ্রায়। বিরহ দশা অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। সে বলে—

"প্রাণের ঈশ্বরী বিনে তেজিব পরাণ।
মৃতবত কিবা মোর কিবা লাজ-মান।।"[৫]

অনেক ভেবেচিন্তে মজনু ভিখারীর বেশে লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এতে শুধু দুজনের চোখের দেখা হয়। মনের অস্থিরতা কমেনি। দ্বিতীয়বার সে আবার গেল। লায়লী ভিক্ষা দেবার ছলে মজনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে উভয়ে ধরা পড়ে যায় দ্বাররক্ষকের কাছে। দ্বাররক্ষক লায়লীর পিতাকে জানালে লায়লীর পিতা কয়েকজন গুণ্ডাকে আদেশ দিলেন কয়েসকে মারার জন্য। দুঃখ, ক্ষোভ যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যায় কয়েস। একমাত্র পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখে পিতা-মাতা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। পাগল মজনু বাড়ি ঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় জঙ্গলে। এদিকে লায়লীর ও মজনু বিরহে অনেক কষ্টে দিন কাটে। শয়ন-ভোজন ত্যাগ করে সে বিলাপ করতে থাকে। আমীর ছেলের দুঃখে কাতর

হয়ে লায়লীর পিতা মালিক সুমতির কাছে মজনুর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। সুমতি মজনুর মত বদ্ধ পাগলের সাথে লায়লীর বিয়ে দিতে সম্মত হলেন না। পরে আমীরের অনুরোধে এক শর্তে রাজী হলেন মজনু পাগলামি না করলে বিয়ে হবে। আমীর নজদ বন থেকে মজনুকে নিয়ে এলেন। ক্ষৌরকর্ম করালেন, স্নান শেষে ভাল বস্ত্র পরিয়ে ছেলেকে নিয়ে সুমতির গৃহে নিয়ে গেলেন। এমন সময় লায়লীর কুকুর দেখে মজনু তাকে জড়িয়ে পদচুম্বন করল। এ দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল। আমীর লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন, বিয়ে হলনা। মজনু পুনরায় পাগল হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল। লায়লীর প্রেম জপতে জপতে মজনু ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হল।

"তপোবনে তাপসী জপএ প্রভুনাম।
মায়াজাল কাটিল, কাটিল ক্রোধ কাম।"[৬]

মজনুকে সুস্থ করার জন্য যোগীর কাছে নিয়ে গেলে সে যোগীর কাছে প্রেমদীক্ষাই প্রার্থনা করে। আমীর বুঝতে পারেন এ পুত্রকে আর ভাল করা যাবেনা। ভগ্নহৃদয়ে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে লায়লীর বিয়ে হয়ে যায় ইবনে সালামের পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু বাসরঘরেই লায়লী স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে। মজনু এক বৃদ্ধার কাছে লায়লীর বিয়ের সংবাদ শুনে খুব মর্মাহত হয়। সে লায়লীর এই প্রবঞ্চনার কথা নিজের অঙ্গচর্মে লিখে বনের পাখি দিয়ে লায়লীর কাছে পত্র পাঠায়। লায়লী পত্রের উত্তরে জানায়—

"সেই সত্য প্রথমে করিছি তুম্ম সঙ্গে।
জাবত জীবন মুয়ি না করিব ভঙ্গ।।

মোহের যৌবনফল না হইছে উচ্ছিষ্ট।
গোপত রতন পরে না পড়িছে দৃষ্ট।।"[৭]

লায়লীর এই পত্র মজনু কবজ করে গলায় বেঁধে রাখে। নয়ফলরাজ মৃগয়ায় এসে মজনুর সঙ্গে দেখা হয়। মজনুর এ দুরাবস্থা দেখে নয়ফলরাজ তাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। লায়লীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে নয়ফল এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে লায়লীকেও প্রাসাদে নিয়ে আসেন। প্রথমে ইচ্ছে ছিল মজনুর সঙ্গে লায়লীর বিয়ে দেবেন, কিন্তু লায়লীর রূপে পাগল হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিজে বিয়ে করতে চাইলেন। আর এজন্য বিষ প্রয়োগে মজনুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রে নিজেই ফেঁসে যান এবং বিষ পানে তার মৃত্যু হয়। লায়লীর পিতা এসে লায়লীকে নিয়ে যান। মজনু আবার বনে চলে যায়। কিছুদিন পরে লায়লীর পিতা সপরিবারে শ্যামাদেশে যাত্রা করেন। নজদ বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় লায়লী রাত্রে মজনুর সাথে দেখা করতে যায় এবং নিজেকে মজনুর কাছে সমর্পণ করতে চাইল। কিন্তু মজনু তাতে বাঁধা দেয় এবং বলে—

"গুপ্তরূপে তোহ্মাকে করিলে পরিণয়
আরব নগরে লোক দুষিব নিশ্চয়।"[৮]

সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়। এরপর থেকে লায়লী বিরহানলে ক্রমশ মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হয়। এক হেমন্তে ঝরে পড়ল লায়লীর জীবন। মৃত্যুর আগে লায়লী মাকে অনুরোধ করল তিনি যেন লায়লীর মৃত্যু সংবাদ মজনুর কাছে পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়ে মজনু লায়লীর কবর দেখতে আসে। ঘ্রাণ শক্তিতে মজনু লায়লীর কবর চিনে নেয়। কবরে বিলাপ করতেই করতেই মজনুর দেহ ক্রমে নিঃসাড় এবং নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সেই কবর প্রণয়কামী মানুষের তীর্থস্থান হয়ে রইল চিরকালের জন্য। ব্যর্থ প্রেমের দাহ পেয়ে যারা মরবে তাদের আশ্বস্ত করেছেন কবি—

"দুনিয়াতে পাইল দুখ কবরেতে হৈব সুখ
নিজপ্রিয় লইবেন বুকে।"[৯]

'লায়লী-মজনু, পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি যে দৌলতউজির বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি ফারসি খুব ভালভাবে বুঝতেন, তাই ফারসি কাব্য তাই ফারসি কাব্য থেকে অনূদিত করেন কাব্যটি। কবির পীরভক্তি প্রমাণ করে যে আরবি ভাষায় তিনি জানতেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল। লায়লীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র থেকেই ঋণ গ্রহণ করেছেন। অনেক জায়গায় আমরা সংস্কৃত শ্লোকেরও ব্যবহার দেখি। যেমন- "স্ত্রীয়াশ্চরিতাম দেবাণ জানন্তি কুত মনু।"[১০] অলঙ্কারবহুল ভাষার ব্যবহার ছিল মধ্যযুগের কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাহারাম খানের ভাষা আগাগোড়া আলংকরিকতাপূর্ণ। উপমা-রূপক-অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকার কাব্য দেহে ছড়িয়ে রয়েছে। অলংকার ব্যবহারে কবি প্রচলিত বস্তু, ভাব, ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি-নিজস্বচিন্তাপ্রসূত অলংকারও সৃষ্টি করে প্রয়োগ করেছেন।

'লায়লী-মজনু' কাব্যে মজনুর আচরণ বাস্তব জীবনের কিছুটা অসংলগ্ন থাকলেও লায়লী চরিত্র সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মজনুর বৈরাগ্য পাঠকের মনে দাগ না কাটলেও প্রতিবাদী লায়লীকে দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। যে যুগে নারীর কণ্ঠরোধ ছিল সে যুগেই সে তেজস্বিনী রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সবার বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং সে নিজে পণ করেছিল মজনু ছাড়া অন্য কাউকে স্বামীর অধিকার দেবেনা। তাই লায়লীর মা-বাবা জোর করে বিয়ে দিলেও বাসর ঘরে ঐ স্বামীকে পদাঘাত করে প্রত্যাখ্যান করে। কাহিনি হিসেবে লায়লী-মজনু কাব্যে তেমন আকর্ষণ নেই। কাহিনি খুব ঋজু, বৈচিত্র্যহীন। পাঠশালায় পড়তে পড়তে দুটি কিশোর-কিশোরীর পরিচয় হল, প্রণয় হল কিন্তু পরিণয় হলনা। পিতা-মাতা বাঁধ সাধলেন। মিলনের পথ বন্ধ হলে মজনু ছদ্মবেশ নিল, তাতেও যখন বাঁধা এল তখন সে পাগল হয়ে গেল। এরপর তার ভূমিকা উন্মাদনার। কিন্তু লায়লী উন্মাদিনী হয়নি। তার চিত্তে প্রেমশিখা অণির্বাণ জ্বলেছে, সে অহরহ দগ্ধ হয়েছে। সে প্রলোভন দমন করেছে, শাসন-তর্জন উপেক্ষা করেছে, তথাপি প্রেমকে মিথ্যা হতে দেয়নি। পত্র দিয়ে তার প্রেমের স্বীকৃতি জানিয়েছে, সাক্ষাত করে প্রেম ভিক্ষা করেছে, মৃত্যুর পূর্বমূহুর্তে প্রেমিকের কথা স্মরণ করেছে। মজনুর ছেয়ে লায়লীর বেদনা অধিক জ্বালাময়ী তবে ত্যাগে দুজনেই মহান।

লায়লী-মজনুর কাহিনি নিয়ে দুভাষী পুথিকার মহম্মদ খাতেরও 'দেওয়ানা-মজনু' নামে একটি কাব্য রচনা করেছেন। খাতেরের কাব্যটি মিলনাত্মক। কাব্যের শেষে দেখানো হয়েছে মারা যাওয়ার পর বেহেস্তে গিয়ে দুজনের মিলন হয়েছে-"মজনুর পাকজান প্রভু সখা ছিল।। বেহেস্তে লায়লী সঙ্গে যাইয়া মিলিল।"[১১] বাহারাম খানের 'লায়লী-মজনু'তে মজনুর পিতার পরিচয় স্পষ্ট নয়। একবার শুধু কবি বলেছেন আরবের অধিপতির ছেলে মজনু। কিন্তু পরবর্তী কোন ঘটনায় আমরা রাজকীয় কোন কাহিনির পরিচয় পাইনা। কিন্তু খাতেরের কাব্যে মজনুর পিতার রাজত্ব ও রাজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাহারাম খানের কাব্যে লায়লীর পিতার নাম সুমতি কিন্তু খাতেরের পুথিতে দেখা যায় লায়লীর পিতার নাম আহয়াল সওদাগর। কবি খাতের তাঁর পুথিতে 'আলম বিবির কেচ্ছা অংশ' নামে একটা উপকাহিনি যোগ করেছেন যা বাহারাম খানের কাব্যে নেই। এই উপকাহিনিটি কোন ফারসি কাব্যে আছে কি না তা নিয়েও সন্দেহ। তবে আমরা ধারণা করতে পারি উপকাহিনি অন্য জায়গা থেকে শুনে কবি তাঁর পুথিতে কাহিনিটি যুক্ত করেছেন।

লৌকিককাব্য হিসেবে 'লায়লী-মুজনু'র আবেদন প্রবল। এই কাব্যটি সুফিমতের রূপক কাব্য হলেও বাংলায় কাব্যটি অনূদিত হয়েছে মানবিক কাব্য হিসেবে। এই কাব্যের প্রেম আবেদন সার্বজনীন। আজও সকল প্রেমিকের হৃদয়ে লায়লী-মজনুর প্রেম সাড়া জাগায়।

'শিরি-ফরহাদ': ফার্সি প্রণয় উপাখ্যানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকটি প্রণয় উপাখ্যান হচ্ছে শিরি ফরহাদের প্রেম কাহিনি। গল্পের নায়ক ফার্সিক রাজকুমার আর নায়িকা আর্মেনীয় রাজকুমারী। এই দুজনকে ঘিরে রচিত হয়েছে পারস্যের চিরকালীন বিয়োগান্তক প্রেমগাথা। মহাকবি ফিরদৌসী তাঁর কাব্য 'শাহনামা'য় বিবৃত করে গেছেন এই

কাহিনির কথা। তবে মূল কাব্যটির রচয়িতা হচ্ছেন ফারসি কবি নিজামী গঞ্জবী। তেরশতকের শেষদিকে দিল্লীতে বসে ভারতীয় ফারসি কবি আমীর খসরু লিখেছেন 'শিরিন-খসরূ' কাব্য। বাংলায় দুভাষী পুথিকার আব্দুল গণি শিরি ফরহাদ এর কাহিনি নিয়ে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রচনা করেন 'শিরি-ফরহাদ' নামে একটি কাব্য।

মূল কাহিনিতে আমরা দেখি পারস্যরাজ হরমুজ বাদশার ছেলে রাজকুমার খসরূ। একদিন রাতে খসরূর পিতামহ আশিরবান স্বপ্নে আসেন খসরূর কাছে এবং তাকে উপহার হিসেবে দিলেন তিনটি বর-একটি হচ্ছে শিরিন নামে এক পরমাসুন্দরী নারী, দ্বীতিয়টি হচ্ছে শাবদিজ নামে এক দুরন্ত অশ্ব, যে পবনকেও পেছনে ফেলে ছুটে। আর পারস্য নামে এক বিশাল রাজ্য। সকালে উঠে সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হল তার। সে তার বন্ধু সাপুরকে সব খুলে বলে। সাপুর ছবি আঁকে চিত্রকর। খসরূর কাছে সব শুনে বুঝতে পারেন এ তো আর্মেনীয় রাজকুমারী শিরিন। শাপুরের কাছে শিরিনের রূপের বর্ণনা শুনে খসরূ শিরিনের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠলেন। শাপুর কৌশলে আর্মেনীয় রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করেন। শিরিনকে খসরূর ছবি দেখিয়ে সব খসরূর কথা সব খুলে বললেন। শিরিন খসরূর ছবি দেখে খসরূর প্রেমে পড়ে গেলেন। অনেক ঘটনার পর শিরিন এবং খসরূর দেখা হয়, দুজনেই আবেগাপ্লুত। খসরূ শিরিনকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু শিরিন সহজে ধরা দিলেন না; খসরূকে শর্ত দিলেন বাহারামের নিকত থেকে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। খসরূও সেই শর্তে রাজি হলেন। তিনি সিজারের সাহায্যে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

এইসময় কাহিনিতে আগমন ঘটে ফরহাদ এবং মরিয়মের। মরিয়ম হচ্ছেন সিজারের কন্যা। সিজার শর্ত দিয়ে সাহায্য করেছিলেন- শর্ত ছিল খসরূকে বিয়ে করতে হবে কন্যা মরিয়মকে এবং মরিয়ম যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন খসরূ দ্বীতিয় বিয়ে করতে পারবেন না। আর এদিকে শিরিনের জীবনে আর ও এক পুরুষের আগমন ঘটে- তিনি হচ্ছেন পাথর খোদাইকর ভাস্কর ফরহাদ। শিরিনকে একপলক দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যান ফরহাদ। ফরহাদের এই ভালোবাসার কথা জানতে পারেন খসরূ। ডেকে পাঠালেন ফরহাদকে। বুদ্ধি করে অসম্ভব এক শর্ত দিলেন ফরহাদকে-বললেন যে পাহাড় কেটে জলের নহর আনতে হবে দেশে, তবে তিনি নিজেই শিরিনের সাথে ফরহাদের বিয়ে দেবেন। ফরহাদ আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। "লইয়া শিরির নাম তেসা হাতে লিয়া পাহাড় উপরে মারে বিছমিল্লা বলিয়া।"[১২] ফরহাদের এই নিষ্ঠা দেখে শিরিনেরও মন গলে গেল। তিনিও একসময় তার মনপ্রাণ ফরহাদের নামে সপে দেন, এরপর তিনি দেখা করতে এলেন ফরহাদের সঙ্গে- "আইনু তেরা দিদার দেখিতে পাহাড় তুমি যার খাতেরেতে।"[১৩]

ফরহাদের প্রেমের একনিষ্ঠতা তাকে যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়, তখনই রাজা খসরূ ছল করে খবর পাঠালেন শিরিন মারা গেছে। ফরহাদ এই খবর শুনে পাহাড়চূড়া থেকে নিজের কাটা জলের নহরে ঝাঁপ দেন। ফরহাদের এই দুঃখজনক মৃত্যুর খবর শিরিনের কাছে পাঠান। এই ঘটনার কিছুদিন পরে খসরূর প্রথম স্ত্রী মরিয়মেরও মৃত্যু হয়। শিরিন খসরূর ছলনার কথা জানতে পেরে খসরূকে বিয়ে করতে অস্বীকার শুরু করেন। পরে অনেক ঘটনার পর দুজনের মিলন হয়। আব্দুল গণির পুথিতে এখানেই কাহিনির সমাপ্তি। কিন্তু নিজামীর কাব্যের পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক। সেখানে আমরা দেখি অনেক চেষ্টার পর ও খসরূ শিরিনকে বিয়ের জন্য রাজী করাতে পারলেন না। শিরিনের মন গলানোর জন্য পণ ধরলেন খসরূ। একবার বনে গিয়ে বিপদে পড়লেন শিরিন-তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বনরাজ সিংহ। বাঁচার পথ না দেখে ভীত হয়ে পড়লেন শিরিন। এমন সময় দেবদূতের মত কোথা থেকে উদয় হলেন খসরূ। অসীম সাহসী খসরূ নিজের প্রাণের বাজি রেখে শিরিনকে বাঁচালেন। শিরিন এই ঘটনায় অভিভূত হয়ে খসরূর সাথে বিয়েতে সম্মত হলেন। শুরু হল বিয়ের প্রস্তুতি। এমন সময় ভিলেনের মতো রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন শিরোয়ে। শিরোয়ে হলেন মরিয়মের গর্ভে খসরূর ঔরসজাত পুত্র। ততদিনে যৌবনে পা দিয়েছে সে। শিরিনের রূপে সে ও পাগল হয়ে উঠে। প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে সে নিজের পিতাকে হত্যা করে শিরিনের কাছে

বার্তা পাঠাল এক সপ্তাহের ভেতর বিয়ে করতে হবে তাকে। এই খবর শুনে শিরিন নিজের বুকে নিজে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেন। আজও এক কবরে সমাহিত হয়ে আছেন দুটি প্রাণ খসরূ আর শিরিন।

অন্যসব মহৎ গাঁথার মতো ঐতিহাসিক উপাদানসমৃদ্ধ এ কাহিনিতে জড়িয়ে আছে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। ক্ষমতার পালাবদল, কারাগারে নিক্ষেপ আর হরমুজকে অন্ধ করে দেয়ার মত ঘটনা। রাজকুমার খসরূর দুই মামার নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পিতার অবর্তমানে পুত্র খসরূর সিংহাসনে আরোহণ, নতুন রাজার বিরুদ্ধে সেনাপতি বাহারাম শবিনের বিদ্রোহ এবং বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যে রাজা মরিসের নিকটে খসরূর পলায়ন ও আশ্রয়গ্রহণ-ফিরদৌসীর 'শাহনামায়' বিস্তারিত বয়ান করা হয়েছে এই সমস্ত কাহিনি। নিজামীর কাহিনি অবশ্য ফিরদৌসীর চাইতে একেবারেই ভিন্ন ধরনের। ইতিহাসকে অপসারণ করে তিনি মূলত জোর দিয়েছেন গল্পের মানবিক আবেদনের উপর। অগণিত সুফি কবির কবিতায় হাজার বার ধ্বনিত হয়ে আসেছে এই গল্প। পারস্যের বাইরে যেমন পাকিস্তানে এটি মানুষের লোকগীতির অংশ হয়ে গিয়েছে। ইউরোপে এই কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন হাঙ্গেরী ঔপন্যাসিক মোর জোকাই। অসংখ্য ছবি নির্মিত হয়েছে এই কাহিনি নিয়ে। বাংলা এবং হিন্দিতেও শিরি-ফরহাদের কাহিনি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

ইতিহাসেও এই কাহিনির সত্যতা রয়েছে। ইতিহাস অনুসারে খসরূর পিতা চতুর্থ হরমুজের মৃত্যুতে বিদ্রোহের মাধ্যমে সিংহাসন দখল করে নেন সেনাপতি বাহারাম। খসরূর সঙ্গে সিরিয়া পালিয়ে যান শিরিন। সেখানে আশ্রয় নেন বাইজাইন্টাইন সম্রাট মরিসের প্রাসাদে। সেখানে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে ৫৯১ সালে ফিরে আসেন এবং নিজ সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এভাবেই পারস্যের রানির আসনে অধিষ্ঠিত খ্রিস্টান ধর্মানুসারী আর্মেনীয় রাজকুমারী শিরিন। ধীরে ধীরে পারস্যের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সহায়তায় বিভিন্ন উপায়ে নিজের প্রভাব খাটাতে শুরু করেন। ৬১৪ সালে জেরুজালেম দখল করেক্রস অফ জেসাস হস্তগত করে পারসিকরা। রাজধানী তেসফিনে নিয়ে আসা হয় এবং সেটি নিজের কাছে রেখে দেন রানি শিরিন।

তবে এটা ঠিক সমকালীন অন্যান্য কাব্যের চাইতে এই কাব্যে অলৌকিকতার ছড়াছড়ি অনেক কম। খসরূ চরিত্রে বীরত্ব প্রেমিকসত্ত্বা থাকা সত্বেও সাধারণ পাঠকের মনে খসরূ সম্পর্কে সহানুভুতি অনেক কম দেখা যায়। তার ছেয়ে ফরহাদের প্রেম এর একনিষ্ঠতা পাঠকের মনে দাগ কাটে। আমরা আগেই বলেছি 'লায়লী-মজনু' ও 'শিরি-ফরহাদ' বিষাদাত্মক কাব্য। নায়ক–নায়িকার প্রেম জীবন ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। 'ইউসুফ-জোলেখা'য় মিলন বিরহের আলো-ছায়া আছে, কিন্তু উক্ত কাব্যদ্বয় একান্তভাবে বিরহের কাব্য,বেদনার কাব্য। এখানে দেহকেন্দ্রীক প্রেমের স্থুলতা লুপ্ত হয়ে বিরহের তাপ-অনলে এই প্রেম এক প্রমূর্ত অশরীরী রূপ লাভ করেছে। দেহোত্তর এই প্রেমই আস্তে আস্তে ভূমি ছেড়ে ভূমায় প্রগত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহারাম রচিত খাঁ রচিত *লায়লী-মজনু*, নয়া উদ্যোগ সংস্করণ, কলকাতা ২০১২, পৃ- ২২।

২। ঐ, পৃ- ৮২

৩। আজহার ইসলাম,*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুলাই ২০১০, পৃ-১৪৮

৪। আহমদ শরীফ সম্পাদিত,দৌলত উজির বাহারাম খাঁ রচিত *লায়লী-মজনু*, নয়া উদ্যোগ সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ-৯৭

৫। তদেব, পৃ-১০৬
৬। তদেব, পৃ-১৩০
৭। তদেব, পৃ-১৬৮
৮। তদেব, পৃ-২০১
৯। তদেব, পৃ- ২৩০
১০। তদেব, পৃ-৯২
১১। মহম্মদ খাতের, *দেওয়ানা মজনু,* গাওসীয়া লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১২৭
১২। মুন্সি মহম্মদ আব্দুল গনি সাহেব, *শিরি ফরহাদ,* মুসলিম লাইব্রেরি, বাবুর বাজার ঢাকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, পৃ-৯৩
১৩। তদেব, পৃ- ১০৩